পাক্ষিক

আহমদী

একাদশ বর্ষ

চতুর্দ্দশ সংখ্যা

৩১শে মাহে ওফা—১৩২০ হিঃ, শঃ]

[৩১শে জুলাই, ১৯৪১ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلی علی رسوله الکریم *

هو الناصر

খোদা মিলন তত্ত্ব

খোদা-প্রাপ্ত লোক ও দুঃখ-বিপদ

পুন্যশীল ব্যক্তি ও মৃত্যুকালীন কষ্ট

হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ—আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা

(২০শে এহ্‌সান বা জুন মাসের খোৎবা হইতে)

কোন বান্দা বা মানব খোদা হইতে পারেন না। বান্দা বান্দাই, খোদা খোদাই। তবে বান্দা যখন অতিরিক্ত পুণ্য কার্য্য সাধন করার ফলে খোদার এরূপ নৈকট্য লাভ করেন যে, তাঁহার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা খোদার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার সহিত এক হইয়া যায়, তাঁহার উদ্দেশ্য খোদার উদ্দেশ্য হইয়া যায়, তখন তিনি এক ভাবে খোদাই হইয়া যান; তখন তিনি যাহা চান তাহাই হইয়া যায়। অজ্ঞ লোকগণ তখন ভুল করিয়া তাঁহাকে খোদা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, তিনি খোদা হন না, তিনি নিজের ইচ্ছা অভিলাষ কোরবান করিয়া খোদাতে বিলীন হইয়া যান। যদিও বাস্তবতঃ দেখা যায় যে, তিনি যাহাই চাহেন তাহাই হইয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তিনি নিজে কিছু চাহেনই না, খোদা যাহা চাহেন তাহাই তিনি চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা এবং খোদার ইচ্ছা এক হইয়া যায় বলিয়াই তাঁহার বাক্যও পূর্ণ হইতে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বাক্য পূর্ণ হয় না, বরং খোদার বাক্যই পূর্ণ হয়। তাঁহার মুখ-নিসৃত বাণী পূর্ণ হইতে দেখিয়া লোক মনে করে তঁহার জিহ্বায় বড়ই তাছির বা প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার জিহ্বায় কোন প্রভাব নাই, প্রভাব বরং এই জন্য হয় যে, তিনি আপন জিহ্বা কাটিয়া ফেলেন, আপন অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেন, তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছাই থাকে না। তিনি যখন বলেন তখন তাঁহার জিহ্বা বলে না, বরং খোদা বলেন এবং তাঁহার বাক্য যখন পূর্ণ হয় তখন তাঁহার বাক্য নয়, বরং খোদার বাক্য পূর্ণ হয়।

রসুল করীম (ছাঃ) যে বলিয়াছেন, নফল বা অতিরিক্ত পুণ্য কাজের ফলে মানুষের হাত খোদার হাত হইয়া যায়, ইহার অর্থও এই যে, তিনি নিজের হাত রহিত করিয়া দেন এবং তাহা এক যন্ত্র স্বরূপ খোদার হাতে সমর্পণ করিয়া দেন। লিখিবার ব্যাপারে যেমন কলম লেখে না, বরং হাতই লেখে, তদ্রূপ তাঁহার হাত যাহা কিছু করে তাহা তাঁহার হাত করে না, বরং খোদার হাত করেন। এই রূপেই তাঁহার পা খোদার পা হইয়া যায়, তাঁহার চোখ খোদার চোখ হইয়া যায় এবং তাহার জিহ্বা খোদার জিহ্বা হইয়া যায়।

এই সকল লোক যখন কোন দেশে অবস্থান করেন তখন সেদেশে খোদার 'বরকত' বা আশীষ বর্ষিত হইতে থাকে। ইঁহারা যখন কথা বলেন তখন আকাশে ও ভূমণ্ডলে এক পরিবর্ত্তন শুরু হয় এবং যখন হস্ত উত্তোলন করেন তখন হস্ত উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই দিক্‌মণ্ডলে এক পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, তিনি নিজ হস্ত, পদ বা জিহ্বা রহিত করিয়া দেন এবং তাঁহা হইতে যে-কোন কার্য্য প্রসূত হয় তাহা খোদাতা'লার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী হয়। এই স্তরে পৌছিয়াই মানুষ দুনিয়ার আপদ-বিপদ হইতে এই ভাবে রক্ষা পান যে, আপদ-বিপদ তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাঁহার উপর কোন বিপদ বা ব্যাধি আসে না, বা শত্রু তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে না, বা গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার বা বন্দী করিতে পারে না। এই সব কিছুই হয়। যথা—হজরত ইসা (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নবী ছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছিল, বন্দী করিয়াছিল এবং তৎপর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিল। হজরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার রসুল ছিলেন, কিন্তু ফেরাউনের অত্যাচারে তাঁহাকে নিজ দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রসুল করীম (ছাঃ) খোদাতা'লার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম রসুল এবং সকল নবীদের সরদার ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকেও স্বদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তাঁহাকে মার-পিট

করা হইয়াছিল, আহত করা হইয়াছিল, তাঁহার দাঁতও শহীদ করা হইয়াছিল, তাঁহার উপর এরূপ অবস্থাও হইয়াছিল যে তিনি এক গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং কয়েক ছাহাবী বা সহচরের মৃত-দেহ তাঁহার উপর পড়িয়াছিল এবং তিনি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া কাফেরগণ আনন্দ করিয়াছিল। তিনি রুগাক্রান্তও হইয়াছেন এবং কখন কখন দীর্ঘকাল রুগগ্রস্ত রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাণ বাহির হইবার সময় এত কঠোর কষ্ট হইয়াছিল যে, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রসুল করীমের (ছাঃ) প্রাণ বাহির হইবার কষ্ট দেখিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, যাহার ইমান (বিশ্বাস) দুর্ব্বল তাহারই প্রাণ বাহির হইবার সময় কঠোর কষ্ট হয়; কিন্তু রসুল করীমের (ছাঃ) মৃত্যুকালীন কষ্ট দেখিয়া আমার এই ধারণা বিদূরীত হইয়াছে এবং আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইমানের সহিত মৃত্যুকালীন কষ্টের কোন সম্পর্ক নাই।

আমাদের দেশেও সাধারণতঃ এই মনে করা হয় যে প্রাণ বাহির হইবার সময় যাহার অধিক কষ্ট হয় সে মন্দ লোক। অথচ, প্রকৃত পক্ষে, এই কষ্ট দৈহিক শক্তি অনুসারে হয়। কোন ব্যক্তি খুব দৃঢ় এবং বলশালী হয়, আবার কোন ব্যক্তি দুর্ব্বল ও শিথিল হয়। ইহা স্পষ্ট কথা যে, শক্ত বস্তুর মধ্যে যদি কোন জিনিষ আবদ্ধ থাকে তবে তাহা সহজে নির্গত হয়। যথা—যে-দাঁতের মাড়ী শিথিল ও নরম এবং তাহা হইতে পূঁজ বাহির হয় সেই মাড়ী হইতে সহজে দাঁত বাহির হইয়া আসে। পক্ষান্তরে যে-দাঁতের মাড়ী দৃঢ় ও শক্ত তাহা হইতে দাঁত বাহির করিতে ডাক্তারের যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। এখন যদি কেহ বলে যে, যাহার দাঁত সহজে বাহির হইয়া আসিয়াছে সে পুণ্যবান ছিল বলিয়াই তাহার দাঁত সহজে বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর যাহার দাঁত বাহির হইতে কষ্ট হইয়াছে সে পাপী ছিল বলিয়াই তাঁহার দাঁত বাহির হইতে কষ্ট হইয়াছে, তবে তাহা একান্তই ভ্রান্ত কথা হইবে। পাপ-পুণ্যের সহিত দাঁত বাহির হইবার কষ্ট বা আরামের কোন সম্পর্ক নাই, দাঁতের মাড়ীর সহিতই উহার সম্পর্ক। তদ্রূপ কাদায় যদি কোন পেরেক গ্রথিত থাকে, তাহা এক শিশুও অনায়াসে বাহির করিয়া নিয়া আসিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি পাথরে গ্রথিত থাকে এক শক্তিশালী যুবকও তাহা বাহির করিতে পারে না। এইরূপে, শক্তিশালী দেহ হইতে যখন প্রাণ নির্গত করা হয় তখন তাহা অতি কষ্টে নির্গত হইয়া আসে।

এই বিষয়টির আর একটি দিক আছে। যে-ব্যক্তির হৃদয়ে দুনিয়ার মহব্বত বা অনুরাগ রহিয়াছে তাহার প্রাণ নির্গত হইতেও কঠোর কষ্ট হয়। আবার যে-ব্যক্তি জগতের মঙ্গল-কামনায় নিরত তাঁহার প্রাণও অতি কষ্টে নির্গত হয়। দুনিয়ার প্রেমিক ব্যক্তির কষ্ট এই জন্য হয় যে, সে মনে করে, তাহার প্রিয়তম বস্তু তাহার হাত-ছাড়া হইয়া যাইতেছে। নবীদের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবল হয় যে; জগদ্বাসীর এখন তত্ত্বাবধান করিবার কেহ থাকিবে না। এই ভাবিয়া তাঁহারা ব্যকূল হন, এবং মানব জাতির সেবার জন্য তাঁহারা তাহাদের মধ্যে আরো কিছুকাল থাকিতে চান। অতএব উভয়ের জন্যই দুনিয়া ছাড়িয়া যাওয়া কষ্টকর হয়। কিন্তু এক জন দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের জন্য কষ্টানুভব করে, আর এক জন জগদ্বাসীর তত্ত্বাবধানের কথা ভাবিয়া কষ্টানুভব করেন।

মোট-কথা, সংসার প্রেমিক এবং মানবজাতির হিতকামী এই উভয় শ্রেণীর লোকেরই মৃত্যুকালে কষ্ট হয়। কিন্তু অজ্ঞ ও মুর্খ ব্যক্তিগণ এই কষ্টের মূল কারণ এবং ইহার তত্ত্ব অবগত না থাকায় মনে করে যে, ইমানের অভাব বশতঃই এই কষ্ট হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা যখন তাহাদের জ্ঞান লাভ হয় তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, প্রাণ নির্গত হইবার সময় কষ্টানুভব করিবার কয়টি কারণই আছে। কখনো পুণ্যবান ব্যক্তির প্রাণ নির্গত হইবার সময় কষ্ট হয়। আবার কখনো পাপীর প্রাণ নির্গত হইবার সময় কষ্ট হয়, কিন্তু পুণ্যবান ব্যক্তির কষ্ট হয় না। ইহার এক কারণ এই যে, কাহারো শরীর সবল থাকে, কাহারো দুর্ব্বল থাকে। দুর্ব্বল দেহ হইতে প্রাণ অনায়াসেই নির্গত হয়, কিন্তু সবল দেহ হইতে সহজে নির্গত হয় না। প্রাণ বিয়োগের সময় কষ্ট হইবার দ্বিতীয় কারণ হইল সংসার প্রেম, বা দুনিয়ার সংস্কার-কার্য্যের ভাবনা। যাঁহার উপর দুনিয়ার সংস্কার কার্য্যের ভার ন্যাস্ত তিনি নিজের জন্য নয় কিন্তু জগতের সংস্কারের জন্য দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট অনুভব করেন।

মোটকথা আল্লাহতা'লার সকল নবীগণেরই দুনিয়াতে কষ্ট হইয়াছে। কোন নবী বা অলিই এরূপ হন নাই যাঁহার উপর কোন কষ্ট বা বিপদ-আপদ আসে নাই। কিন্তু যে-বিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য লোক হইতে বিশিষ্ট তাহা হইল এই যে, তাঁহাদের উপর এমন কোন কষ্ট বা বিপদ আসে না যাহা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়া দেয়, বা খোদাতা'লার রহমত বা অনুগ্রহ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেন। নতুবা তাঁহাদের উপরও কষ্ট-বিপদ আসে এবং বড় বড় কষ্ট-বিপদ আসে। যথা—পার্থিব আরামের দিক দিয়া রসুল করীমের (ছাঃ) জীবন হইতে আবুজাহেলের জীবন অধিক আরামে কাটিয়াছে। অবশ্য তাহার এই পার্থিব আরাম খোদাতা'লার কোন ফজল বা বিশেষ অনুগ্রহ বশতঃ ছিল না, বরং শয়তানকে যেমন ঢিল দেওয়া হয় তাহাকেও তেমনি ঢিল দেওয়া হইয়াছিল।

অতএব আল্লাহতা'লা মানুষের হাত, পা, বা জিহ্বা হইয়া যাওয়ার এই অর্থ নহে যে, সেই মানুষ বিপদাপদ হইতে মাহফুজ বা সম্পুর্ণ নিরাপদ হইয়া যায়, বরং ইহার অর্থ এই যে, ঈদৃশ মানব এরূপ বিপদাপদ হইতে মাহ্‌ফুজ থাকে যাহা ধ্বংস করিয়া দেয়। নতুবা বাহ্যিক কষ্ট তো নবী, সিদ্দিক, শহীদ বা ছালেহ-গণেরও হয়। শহীদ তো বলেই তাঁহাকে যিনি খোদাতা'লার পথে মৃত্যু বরণ করেন। বদরের যুদ্ধে কাফেরও মারা গিয়াছিল, রসুল করীমের (ছাঃ) সাহাবা বা সহচরও মারা গিয়াছিলেন। তবে কাফেরদের মৃত্যু খোদাতালার 'লানত' বা অভিশাপের অধীন হইয়াছিল এবং সাহাবাগণের (রাঃ) মৃত্যু খোদাতা'লার অনুগ্রহের অধীন হইয়াছিল। কাফেরদের মৃত্যুকে আমরা খোদাতালার এক আজাব বা শাস্তি মনে করি, কিন্তু

ছাহাবাগণের (রাঃ) মৃত্যুকে আমরা খোদাতা'লার এক 'এন্‌আম' বা পুরস্কার মনে করি এবং সম্মানের চক্ষে দেখি।

সার কথা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের হাত বা পা হইয়া যাওয়ার অর্থ এই নহে যে, সেই ব্যক্তি সকল বিপদ হইতে বাঁচিয়া যায়, বরং ইহার অর্থ এই যে, সেই ব্যক্তি আল্লাহতা'লার অনুগ্রহের নীচে আসিয়া পড়ে এবং আল্লাহতা'লার সহিত তাঁহার এরূপ এক সংযোগ সাধিত হয় যে, তাঁহার ইচ্ছা-আকাঙ্খা খোদার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। তিনি এরূপ কোন আকাঙ্ক্ষাই করেন না যাহা রদ হইতে পারে। কিন্তু ইহার এই অর্থ নহে যে, তাঁহার দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত প্রত্যেক আকাঙ্খাও পূর্ণ হয়, বরং ইহার অর্থ এই যে, কেবল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত আকাঙ্খা-সমূহই পূর্ণ হয়। যথা হইতে পারে, খোদাতা'লার এক প্রিয় বান্দার আমাশয় হইল, এবং তিনি পলান্ন খাইতে আকাঙ্খ করিলেন, কিন্তু ঘরে তাহা প্রস্তুত হইল না। কিন্তু তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিতে পারে না।

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ মাওউদ আঃ]

আল্লার বান্দাগণের প্রতি কর্ত্তব্য

রোগীর তত্ত্বাবধান এবং মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন (অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত ও সমাধিস্থ করা) সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন:—

"আমাদের জমাতের এবিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখা উচিত যে, কেহ মৃত্যু লাভ করিলে যথা-সম্ভব সকল জমাত তাহার জানাজায় (মৃত ব্যক্তির মঙ্গলা কামনা করিয়া প্রার্থনায়) যোগদান করা উচিত এবং প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। এই সব বিষয়ই হকুকুল-এবাদ বা বান্দার প্রতি কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। আমি দেখিতে পাই, যে-শিক্ষায় এবং স্তরে খোদাতালা অমাদের জমাতকে পৌছাইতে চাহেন তাহাতে এখনো অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। ইমানদার বলিয়া কেবল দাবী করিলেই চলিবে না, বরং খোদাতা'লা যে-রূপ ইমান চাহেন তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ভ্রাতা ও প্রতিবেশীর 'হক্' বা প্রাপ্য চিনিয়া লওয়া সহজ ব্যবপার নয়। কেবল মুখে চিনিবার দাবী করা অবশ্য সহজ। কিন্তু প্রকৃত সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন কঠিন ব্যপার। মূল কথা এই যে, সকল সৎ প্রচেষ্টা, কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের জন্য ইমান এক ইঞ্জিন স্বরূপ। ইমান লাভ হইলে সকল হকুক্ বা কর্ত্তব্যই আপনা-আপনিই দৃষ্টি-গোচর হয় এবং মানুষ মহা মহা সৎ-কাজ ও সহানুভূতি নিজে নিজেই করিতে থাকে। ইমানের বীজ ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে, কিন্তু ইহা সকলের ভাগ্যে হয় না।" (আলবদর, ২১শে আগষ্ট, ১৯০৩)।

সুরা ফাতেহার তিনটি প্রার্থনা

"সুরাহ ফাতেহায় তিনটি প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে:—

(১) একটি প্রার্থনা হইল—খোদাতা'লা যেন ছাহাবাগণের (অর্থাৎ রসুল করীমের সহচরগণের) মণ্ডলী-ভুক্ত রাখেন এবং তৎপর মসিহ মাওদের জমাত-ভুক্ত রাখেন—যাঁহাদের সম্বন্ধে কোরান শরীফে বলা হইয়াছে—وآخرين منهم لما يلحقوا بهم (অর্থাৎ, "শেষ আর এক দল যাহারা এখনো আসিয়া মিলিত হয় নাই")। বস্তুতঃ ইসলামে এই দুইটি জমাত বা মণ্ডলীই 'মুনয়েম' বা পুরস্কার-প্রাপ্ত জমাত। "সিরাতাল্লাজীনা আনআমতা আলাইহিম" ("অর্থাৎ, সেই লোকদের পথে পরিচালিত কর যাহাদের প্রতি তুমি পুরস্কার বা অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছ")—বাক্যেও এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে। সমস্ত কোরান পাঠ করিয়া দেখ, জমাত দুইটিই। তন্মধ্যে একটি হইল, "ওয়া আখেরীনা মিন্‌হুম" এর জমাত—যাহারা সাহাবাগণের রঙ্গেই রঙ্গীন এবং মসিহ মাওউদের জমাত। অতএব তোমরা যখন নামাজে বা নামাজের বাহিরে এই দোয়া কর যে, اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم তখন হৃদয়ে এই খেয়ালই রাখিও যে, আমরা ছাহাবা এবং মসিহ মাউদের (আঃ) জমাতের পথ অনুসন্ধান করি।

(২) এই তো গেল সুরাহ ফাতেহার প্রথম দোয়া। দ্বিতীয় দোয়া হইল غير المغضوب عليهم (অর্থাৎ, "সেই লোকদের পথে পরিচালিত করিও না যাহাদের প্রতি তোমার অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে")। ইহাতে সেই লোকদের প্রতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যাহারা মসিহ মাউদকে দুঃখ দিবেন। এই দোয়ার মোকাবেলায় (Counter part রূপে) কোরান শরীফের শেষ ভাগে সুরাহ্ "তাব্বাত ইয়াদা আবিলাহাবেয়্যঁ" (অর্থাৎ মসিহ মাওউদের বিরুদ্ধাচারীগণ ধ্বংস হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী) রহিয়াছে।

(৩) তৃতীয় দোয়া হইল—"ওয়ালাজ্‌জাল্লিন" অর্থাৎ "আমাদিগকে পথ-ভ্রষ্টদের পথে পরিচালিত করিও না।" এই দোয়ার মোকাবেলায় কোরান শরীফের শেষ ভাগে সুরাহ্ এখ্‌লাছ আছে—

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد ❋

(অর্থাৎ "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ স্বয়ম্ভু, কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন; তাঁহার কোন সন্তান নাই এবং তিনিও কাহারো সন্তান নহেন এবং তাঁহার সম গুণ, শক্তি ও মর্য্যাদা বিশিষ্টও আর কেহ নাই)। অতঃপর আরো দুইটি সুরাহ আছে—যথা সুরাহ 'ফালাক' ও সুরাহ 'আন্‌নাছ'। এই দুইটি সুরাহ্ সুরাহ 'তাব্বাত' ও সুরাহ 'এখ্‌লাছ'-এর ব্যখ্যা স্বরূপ। এই দুইটি সুরাতে সেই অন্ধকার যুগ হইতে খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে যখন লোক খোদার মসিহকে দুঃখ দিবে এব যখন খৃষ্টান মতবাদের অন্ধকার সমস্ত দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িবে।" (তোহ্‌ফা গুলরবিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১২৩—১২৪)।

বর্ত্তমানে বড়ই সঙ্কট কাল উপস্থিত

প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ—আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা

(বিগত ১১ই এপ্রিল তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম)

আল্লাহতা'লা প্রত্যেক সৃষ্টজীবকেই উহার অবস্থানুযায়ী আত্মরক্ষার উপকরণ দিয়াছেন। কোন কোন জীবকে তিনি এরূপ 'পাঞ্জা' বা থাবা দিয়াছেন যে, তদ্বারা উহা আক্রমনকারীর হাত হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে; কোন কোন জীবকে এমন ঠোঁট বা শুঁড় দিয়াছেন যদ্বারা উহারা আত্মরক্ষা করিয়া লয়। কোন কোন প্রাণীর পায়ে এত শক্তি দিয়াছেন যে, তদ্বারা উহা আক্রমনকারীকে সজোরে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দেয়। কোন কোন জীবের মাথায় এত শক্তি দিয়াছেন যে, সে তদ্বারা শক্রকে পরাজিত করিয়া দেয়, বা অন্ততঃ আত্মরক্ষা করিয়া লয়। কোন কোন প্রাণীকে এরূপ পিচ্ছিল দেহ দিয়াছেন যে উহাকে ধরিলেও ছুটিয়া যায়। কোন কোন জীবকে পাখা দিয়াছেন যদ্বারা উহা উড়িয়া আত্মরক্ষা করে। কোন কোন জীবকে জলে রাখিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরাল করিয়াছেন। কোন কোন জীবকে এত ক্ষুদ্র করিয়াছেন যে উহা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বস্তুর আঁড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়া লয়। কোন কোন প্রাণীকে এরূপ ভাবে আঁকড়িয়া থাকিবার শক্তি দিয়াছেন যে, পদ-দলিত হইয়াও উহা জীবিত থাকে। পিপীলিকা কত ক্ষুদ্র প্রাণী! কিন্তু উহার মুখে আল্লাহতা'লা এত শক্তি দিয়াছেন যে, উহা যখন অতি বলশালী ব্যক্তিকে দংশন করে তখন সে অস্থির হইয়া যায়; উহার মুখে এত শক্তি যে, উহা কাহাকেও দংশন করিলে উহাকে পৃথক করা মুস্কিল হয়।

বস্তুতঃ আল্লাহতা'লা অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম প্রাণিরও আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। একমাত্র মানবেরই তিনি আত্মরক্ষার বাহ্যতঃ কোন উপায় করিয়া দেন নাই, অর্থাৎ তাহাকে এমন কোন থাবা, ঠোঁট, বা শিং ইত্যাদি দেন নাই যদ্বারা সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, বা তাহাকে জলের বা মাটীর নীচে রোদ-বাতাস ছাড়া থাকিবার, বা আকাশে উড়িয়া আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা দেন নাই। তাহার আত্মরক্ষার উপায় তিনি তাহার মস্তিষ্কে রাখিয়াছেন। মস্তিষ্কের সাহায্যে সে তরবারী, বন্দুক, কামান, মেশিনগান, বোমা, উরুজাহাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ উপকরণাদি আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা মানবের মস্তিষ্কে থাকা সত্ত্বেও কখন কখন কোন কোন জাতিকে এই সকল উপকরণ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। ইহারা হইল পরাধীন জাতি-সমূহ। শাসক জাতি-সমূহ পরাধীন জাতি-সমূহকে এই সকল অস্ত্র রাখিবার অবাধে অনুমতি দেয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সকল পরাধীন জাতির আত্মরক্ষার উপায় কি? যে-খোদা পশু-পক্ষী ও কীট পতঙ্গকেও নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী আত্মরক্ষার বিভিন্ন উপকরণ দিয়াছেন সেই খোদা অবশ্য মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য মস্তিষ্ক দিয়াছেন। কিন্তু এই মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলে কোন কোন কোন জাতি অধিক আত্মরক্ষার উপকরণ প্রস্তুত করিয়া নিজকে নিরাপদ করিয়া নিয়াছে, কিন্তু অপর জাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। অন্য কোন প্রাণীকে কখনো কেহ জাতি হিসাবে আত্মরক্ষার উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। সকলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী বাদশাহরও এই রূপ আদেশ করিবার ক্ষমতা নাই যে, ভবিষ্যতে পাখীর পাখা হইবে না, বা মাছ জলে থাকিবে না, বা সাপ মাটির নীচে থাকিতে পারিবে না। দুনিয়ার কোন গবর্ণমেন্ট এরূপ নির্দ্দেশ দিতে পারে না যে, বিড়ালের থাবা হইবে না। কিন্তু দুনিয়াতে কোন মানুষ অপর মানুষকে অত্মরক্ষার উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। বাহ্যতঃ তো ইহাই মনে হয় যে, আল্লাহতা'লা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষকে আত্মরক্ষার উপায় হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা কি এরূপ করিতে পারেন? তিনি কি মানুষকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াও তাহাকে আত্মরক্ষার উপকরণ হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারেন? কোরান-করীম হইতে বুঝা যায় যে, এরূপ হইতে পারে না। আল্লাহতা'লা বে-ইন্‌ছাফ নহেন। তিনি প্রত্যেক জাতিরই আত্মরক্ষা ও উন্নতির উপকরণ করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন জাতি যখন অপর জাতিকে আত্মরক্ষার উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। তখন সে-জাতির আত্মরক্ষা কেমন করিয়া হইবে? আল্লাহতা'লা কোরান করীমে ঈদৃশ জাতির আত্মরক্ষার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন, তাহা হইল দোয়া। এরূপ অবস্থায় দোয়াই একমাত্র অস্ত্র, দোয়াই তুপ, বন্দুক, মেশিনগান বা উরুজাহাজ। আল্লাহতা'লা কোরান করীমে বলিয়াছেন—"কেহ যখন খাটি ভাবে আমাকে ডাকে আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই;" আবার বলিয়াছেন, "মুজ্‌তার অর্থাৎ নিঃসহায় নিরুপায় ব্যক্তি যখন অধীর হইয়া আমাকে ডাকে তখন তাহার ডাকও আমি শুনি।" আবার বলিয়াছেন, "মোমেনগণ যখন দুনিয়ার অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠে, 'মাতা নাছরুল্লাহ্‌'—অর্থাৎ, আল্লাহতা'লার সাহায্য কোথায় তখন 'আলা নাছরুল্লাহি করীব' অর্থাৎ তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্ত্তী।"

কোন কোন জাতি কখন কখন আত্মরক্ষার উপকরণ হইতে বঞ্চিত হয় সত্য, কিন্তু তখন তাহাদের জন্য দোয়া রূপ অস্ত্র বিদ্যমান থাকে। নবীদের জমাত প্রতিষ্ঠায় আপন 'কুদরত' বা শক্তি প্রদর্শনই আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহতা'লা দেখাতে চান যে, তিনিই এই জমাত প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন এবং তিনিই ইহাকে রক্ষা করিবেন। তাই তিনি সেই জমাতকে বাহ্যিক উপকরণ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেন, যেন মাত্র একটি অস্ত্রই তাহাদের সম্মুখে থাকে, অর্থাৎ খোদাতালার সাহায্যের অস্ত্র।

আমাদের জমাতও আল্লাহ্‌তা'লার এক নবী বা মামুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাই ইহা আল্লাহ্‌তা'লার সুন্নত বা চিরন্তন নিয়মানুযায়ী বিশেষ রূপে দুর্ব্বল। অবশ্য ভারতের অন্যান্য জাতিসমূহও বাহ্যিক অস্ত্র হইতে বঞ্চিত; হিন্দু, শিখ ও অন্যান্য মোসলমান কাহারো অস্ত্র রাখিবার অনুমতি নাই। কিন্তু তাহাদের একটি অস্ত্র আছে—তাহা হইল জনবল। আমরা ইহা হইতেও বঞ্চিত। অন্যান্য জাতির জনবল থাকায় গবর্ণমেন্টকে তাহাদিগকে খুসী রাখিতে হয়। অন্যান্য গবর্ণমেন্টও তাহাদিগকে খুসী রাখিতে চায়। কিন্তু আমাদের জনবল নাই বলিয়া আমাদিগকে খুসী রাখিবার কাহারো প্রয়োজন হয় না। দুনিয়া যে-জিনিষের সম্মান করে তাহা আমাদের নিকট নাই। দুনিয়াতে হয় তো শক্তির সম্মান করা হয়, আর না হয় তো জনবলের সম্মান করা হয়। কেননা, জন-বল-সম্পন্ন জাতিও বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে গবর্ণমেন্টের অনেক অসুবিধা ঘটাইতে পারে। কিন্তু আমাদের নিকট এই জনবলও নাই। অতএব **আমাদের একমাত্র অস্ত্র হইল** দোয়া। তাই দোয়ার উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হইবে। যাহার নিকট মাত্র একখানা অস্ত্রই আছে এবং সে তাহাও দূরে ফেলিয়া দেয় তাহার মত হতভাগা আর নাই। কোরান শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন—"খুজ্‌ হিজ্‌রাকুম—অর্থাৎ সর্ব্বদা নিজ অস্ত্র সঙ্গে রাখিও"। যাহাদের নিকট বন্দুক ও তরবারী আছে তাহাদের প্রতি তো বন্দুক ও তরবারীই সঙ্গে রাখিবার আদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের নিকট তাহা নাই তাহাদের প্রতি আদেশ ইহাই যে, সর্ব্বদা দোয়ায় লাগিয়া থাক।

ইহা স্পষ্ট কথা যে ব্যবহার করিলেই অস্ত্র দ্বারা উপর লাভ হয়। কাহারো নিকট যদি খুব ভাল অস্ত্র-ও থাকে, কিন্তু সে প্রয়োজন কালে তাহা দূরে ফেলিয়া রাখে তবে সেই অস্ত্র তাহার কোন কাজে আসিবে না। তদ্রূপ দোয়াও যদি চাওয়া না হয়, তবে উহা এক শক্তিশালী অস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও উহা কোন কাজে আসিবে না। বোমা যেমন শত্রুর উপর নিক্ষিপ্ত হইলেই কাজে আসে, তদ্রুপ দোয়াও চাওয়া হইলেই কাজে আসে। কেবল মুখে একথা বলিলে যে, আমাদের নিকট দোয়ার অস্ত্র আছে, কোন ফায়দা বা উপকার হইবে না। ইহা দ্বারা উপকার লাভ করিতে ইহলে রাত-দিন দোয়ায় লাগিয়া থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময় বড়ই সঙ্কট-ময় সময়—এত সঙ্কটময় যে দুনিয়াতে ইহাপেক্ষা অধিকতর সঙ্কটময় অবস্থা ইতিপূর্ব্বে কখনো আসে নাই। আর আমাদের মত দুর্ব্বল জাতির তো একান্তই সঙ্কটের সময়। একটি জাহাজও যদি আসিয়া বোমা বর্ষণ কর তবে তাহারও আমরা মোকাবেলা করিতে পারিব না। বর্ত্তমান যুদ্ধের ধ্বংসের এক নূতন ছবি বুলগ্রেডের ধ্বংসের ব্যাপারে আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক লক্ষ লোকের আবাদ সহর ২৪ ঘণ্টায় ধ্বংস হইয়া গেল। সেই সহরে এখন মৃতদেহ এবং ঈটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। কয়েক মাইল বিস্তৃত সহর এখন ধ্বংস স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। লক্ষ লক্ষ লোকের বাস এক সহরই যদি এইরূপে উৎসন্ন হইয়া যাইতে পারে তবে গ্রামের তো কথাই নাই। এযুগে এমন বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দুই শত বা চারি শত গজ পর্য্যন্ত পাল্লা করে। আমাদের দেশের গ্রাম-সমূহ তো এত ছোট ছোট যে, সেগুলি এক একটি বোমাতেই বিধ্বস্ত হইতে পারে।

অতএব বর্ত্তমান সময় অতি বিপদের সময়। এই বিপদের সময়েও যদি আমরা আমাদের নিকট যে-একমাত্র অস্ত্র আছে তাহাও ব্যবহার না করি, তবে আমাদের চেয়ে বোকা আর কেহই হইতে পারে না। অতএব দিবা-রাত্র এই চিন্তাই হওয়া উচিত এবং হৃদয়ে এক উদ্বেগের ভাব হওয়া উচিত যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের দোয়া শ্রবণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই, মানুষের হৃদয়ে কঠোরতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মানুষ বড় আনন্দের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা করে এবং বলে, অমুক সহরের উপর আক্রমণ হইয়াছে, অমুক জায়গায় এই ভাবে লোক মারা গিয়াছে। তাহাদের ভাবা উচিত যে, যাহারা মারা যাইতেছে তাহারাও কাহারো পিতা, বা কাহারো পুত্র, বা কাহারো ভাই। কেহ-বা ক্রন্দনশীল বিধবা, কেহ-বা মাতা, কেহ-বা এতিম বাচ্চা রাখিয়া মারা যাইতেছে। ঈদৃশ অবস্থায় এই সকল খবর পড়িবার সময় তো এই মনে করা উচিত যেন কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত-দেহের নিকট দণ্ডায়মান আছে। এখন রোদন-ক্রন্দন করিবার সময়—এমন রোদন-ক্রন্দন যাহাতে খোদার 'আরশ' বা সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে। আমাদের খোদা এক জিন্দা খোদা। এক জিন্দা খোদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি আমরা এই আপদ-বিপদ হইতে বাঁচিতে চেষ্টা না করি তবে আমাদের চেয়ে গাফেল বা উদাসীন আর কে হইতে পারে? জগদ্বাসী নিজেদের সরঞ্জাম—যথা, তুপ, মেশিনগান, উরুজাহাজ ইত্যাদির উপর ভরসা করে, কিন্তু আমাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপর। দুনিয়ার লোক সরঞ্জামের পিছে ধাবিত হইতেছে—ইংরাজই বল, জার্ম্মানীই বল, জাপানই আর আমেরিকাই বল, সকলেই স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া দিবা-রাত্র বোমা, তুপ, উরুজাহাজ ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মান-কার্য্যে ব্যপৃত; কিন্তু আমাদের কাজ খোদাতা'লার 'ফজল' বা অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা। ঐসকল লোক যেমন দিন-রাত আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত কার্য্যে ব্যপৃত আছে, তেমনি আমাদের সকলেরও দিনরাত দোয়ায় ব্যপৃত হওয়া উচিত। কেননা, মোকাবেলা করিবার সমপরিমাণ শক্তিশালী না হইলে মোকাবেলায় কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। প্রত্যেক দোয়াই তুপ-বন্দুকের মোকাবেলা করিতে পারে না। দোয়া-ও যুদ্ধের সরঞ্জামের অনুরূপ শানদার বা মহৎ হওয়া উচিত। সরঞ্জাম প্রস্তুতে যেমন তাহারা জোর দিতেছে, তেমনি দোয়া বা প্রার্থনায় আমাদের জোর দিতে হইবে যেন আল্লাহতা'লা ইসলাম ও আহমদীয়তকে এই সকল সরঞ্জামের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

স্মরণ রাখিও, আমাদের উপর মহা দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। আল্লাহ্‌তা’লার পবিত্র আমানত (Trust) ও তাঁহার অভিনব নিদর্শনাদি আমাদের হেফাজত বা সংরক্ষণে আছে। আমাদের কবরস্তানে যদি একটি বোমাও পড়ে তবে আমরা কি করিতে পারি ? আমরা কেমন করিয়া এগুলিকে রক্ষা করিতে পারি ? আমরা এগুলিকে তখনই রক্ষা করিতে পারিব, যখন আমারা আকাশে এরূপ শক্তিশালী বোমা, উরু জাহাজ, সামুদ্রিক জাহাজ এবং গোলা-বারুদ প্রস্তুত করিতে পারিব যাহা বর্ত্তমান বোমা, জাহাজ, এরোপ্লেন ও গোলা-বারুদকে ব্যর্থ করিতে পারিবে।

এইরূপ যন্ত্রাদি আমরা আকাশে কেবল দোয়ার সাহায্যেই প্রস্তুত করিতে পারি, এবং দোয়াও রাতদিন ব্যথা, বেদনা ও উদ্বেগের সহিত করা উচিত এবং এরূপ চেষ্টা-উদ্যমের সহিত করা উচিত যেমন চেষ্টা-উদ্যমের সহিত অন্যান্য লোক যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত আমাদের এই অবস্থা না হইবে সে-পর্যান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতকার্য্যতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র।

এই দিনগুলি অবহেলা ও ঔদাসিন্যের সহিত কাটাইও না। যুদ্ধের খবর যখন পড়, তখন তোমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠা উচিত এবং উহা হইতে তোমাদের শিক্ষা ও সাবধানতা লাভ করা উচিত। কোরান-করীম যেমন কাফেরদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে যে, তাহারা সতর্কতা অবলম্বনের উপকরণগুলি দেখিয়াও অন্ধের ন্যায় পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়, তোমাদের সেরূপ হওয়া উচিত নহে। তোমাদের রাত-দিন রোদন-ক্রন্দন করিয়া কাটান উচিত। আজ মানুষের অধিক ক্রন্দন করিবার এবং কম হাসিবার সময় আসিয়াছে, বরং মানুষের উচিত এখন কেবল ক্রন্দনই করা এবং খুবই কম হাসা, যেন আকাশ হইতে সেই উপকরণ সৃষ্টি হয় যাহা আমাদের এবং অন্যান্য লোকদেরও রক্ষার উপায় হয় কারণ তাহারাও আমাদের ভাই। একবার ভাবিয়া দেখ, এক মিনিটে গুলা আসিয়া লাগে বা মাইন ফাটিয়া যায় এবং পলকের মধ্যে হাজার হাজার লোক সমুদ্রের তলদেশে পৌছিয়া মৎস্যের খাদ্যে পরিণত হয়। কোথাও এক মৃতদেহ দেখিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, আর এখানে তো দৈনিক হাজার হাজার মৃতদেহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছে। ইংরাজদের জাহাজ-ডুবির গড়-প্রথা হইল সপ্তাহে ষাট হাজার টন, কখন কখন তো দুই লক্ষ বিশ লক্ষ টন পর্য্যন্ত জাহাজ ডুবিয়াছে। করাচী ও বোম্বাইয়ে যে-সকল জাহাজ চলা-ফেরা করে এগুলি সাধারণতঃ চৌদ্দ পনর শত টন ওজনের। এই সকল জাহাজ সাধারণতঃ মাল বহন করে, কিন্তু এগুলিতেও পাঁচ ছয় শত করিয়া যাত্রী থাকে। অতএব ষাট হাজার টন জাহাজ ডুবিবার অর্থ হইল ছয় হাজার লোক প্রত্যেক সপ্তাহে সমুদ্রের তলদেশে যাইয়া পৌঁছিতেছে, অবশ্য অনেক বাঁচিয়াও যায়। কিন্তু এত লোক ধ্বংস হওয়া সত্বেও ইংরাজগণ আশা ছাড়িতেছে না। এমতাবস্থায় আমরা জিন্দা কৌম হইয়া যদি নিরাশ হইয়া যায় তবে ইহা কত আফসোসের বিষয় হইবে।

অতএব খুব ক্রন্দন কর, একথা মনে করিও না যে, আমরা নিরাপদ আছি। কোন ভূমি-কর্ষণকারী কৃষক যেন একথা মনে না করে যে, তাহার নিকট কেহ পৌঁছিতে পারিবে না। কৃষক মনে করে যে, এই চাষই তাহার দুনিয়া, অবশিষ্ট দুনিয়ার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে, বোমা আজ দূর ও নিকটের প্রশ্ন থাকিতে দেয় নাই। কল্য যে তাহার চাষ নিরাপদ থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কল্যই হয়তো তাহার মাতা-পিতা ও স্ত্রী-পুত্র তাহার চক্ষের সামনে আহত হইতে পারে।

অতএব দোয়া কর, দোয়া কর, দোয়া কর এবং যুদ্ধের সংবাদ হাসির সহিত পড়িও না। কেহ যদি এরূপ ভাবে পড়ে তবে তাহাকে বলিয়া দেও যে, তুমি বড়ই কঠোর-হৃদয় এবং নিষ্ঠুর। নিজেও দোয়া কর, তাহাকেও দোয়া করিতে উপদেশ দাও। এত অধিক দোয়া কর যেন খোদার আরশ কাঁপিয়া উঠে এবং খোদাতা’লার ফজল বা অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইয়া দুনিয়াকে বাঁচায় এবং আমাদিগকেও বাঁচায়।

অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থা এক শিক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বনের স্থল এবং এই অবস্থা দেখিয়া লোকের ‘হেদায়ত’ বা সৎপথ লাভ হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহতা’লা ইচ্ছা করিলে দুনিয়াকে ধ্বংস না করিয়াও হেদায়ত দান করিতে পারেন।

আজ আমি এবিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করিয়া নিজ দায়িত্ব-মুক্ত হইতেছে। অবশ্য ইহার এ অর্থ নহে যে, অতঃপর আর কখনো এসম্বন্ধে কিছু বলিব না। ইহার অর্থ এই যে, আজ আমি স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যে, এখন বড়ই ভয় ও বিপদের সময়। **এই সময় ক্রন্দন করিয়া কাটাও।** এ সময় তোমাদের মধ্যে এরূপ উদ্বেগ ও অস্থিরতা হওয়া উচিত যেন তোমাদের আহার করা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং জল গলদেশে আটকিয়া পড়ে এবং তোমাদের নিদ্রা চলিয়া যায়, এবং তোমাদের এই উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখিয়া আল্লাহতালা বলিয়া উঠেন যে, এই মোমেনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা আরশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। এবং তখন তিনি তাঁহার আরশকে স্থির করিবার জন্য দুনিয়ার উপর ‘রহম’ (দয়া) করেন।

ভ্রান্তি সংশোধন

(ক) বিগত ১৫ ই জুলাই, ১৯৪১ সংখ্যা আহমদীর ৬ পৃষ্ঠায় “ইউরোপে আহমদীয়তের ভবিষ্যৎ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ভুলক্রমে তাহাতে লিখকের নাম দেওয়া হয় নাই। প্রবন্ধটি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মৌলবী আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী বি-এ, বি-টি, এইচ-ডিপ-এড সাহেবের লিখিত।

(খ) বিগত ৩০শে জুন, ১৯৪০ সংখ্যা আহমদীর ৫ পৃষ্ঠায় “প্রকৃতির অভিযান” শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার ২য় কলমের ৭ম লাইনে “বিজ্ঞান কিরে রোধিতে পারে না, জ্ঞান গরিমা অভিমান” স্থলে “হার মেনে যায়, নত করে শির জ্ঞান-গরিমা অভিমান” হইবে।

আহমদীয়া জমাতের কাজা বা বিচার-বিভাগ

ইসলামী পদ্ধতিতে বিচার

[মৌলবী কমর-উদ্দিন সাহেব মৌলবী-ফাজেল]

আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) আহমদীয়া জমাতের মঙ্গলের জন্য 'কাজা' বা বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিচার বিভাগ বহু দিন যাবৎ প্রতিষ্ঠীত আছে এবং ইহাতে ইসলামী বিচার-পদ্ধতিতে পঞ্চায়েতী ভাবে জমাতের মেম্বরগণের পরস্পরের মোকদ্দমার শুনানি ও মীমাংসা হয়। অবশ্য যে-সকল মোকদ্দমা পুলিসের হস্তক্ষেপের যোগ্য সে-গুলির বিচার এখানে হয় না।

এই বিচার-বিভাগ প্রতিষ্ঠীত করিয়া হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) জমাতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল মোকদ্দমা-জনিত কষ্ট ও খরচ হইতেই অব্যাহতি লাভ হইয়াছে তাহা নহে, বরং জমাতের নৈতিক অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ ও সংশোধনেরও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে।

যেহেতু ইসলামী-বিচার সংক্রান্ত রীতি-নীতি অনেকেরই জানা নাই, তাই সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কতেক উল্লেখ করা গেল।

(১) ইসলামী শরীয়ত বা ধর্ম্ম-ব্যবস্থার এক বিধান এই যে, উভয় পক্ষ বিচারকের সম্মুখে: উপস্থিত হইবে। যথা রসুল করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন, দরখাস্তকারী এবং যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে এই উভয়ই কাজী বা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। (মিশ্‌কাত, ৩২১ পৃঃ)।

(২) ইসলামী শরীয়তের অপর এক বিধান এই যে, দরখাস্ত-কারী নিজ দাবী প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ উপস্থিত করিবে; আর যদি প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারে তবে যাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হইয়াছে সে 'হলফ' বা শপথ করিবে। আঁ-হজরত (ছাঃ) প্রমাণ পেশ করার ভার বাদীর উপর এবং 'হলফ' করা বিবাদির উপর—ধার্য্য করিয়াছেন। (মিশ্‌কাত, ৩১৯ পৃঃ)। অপর এক হাদীছে আসিয়াছে—প্রমাণ পেশ করা বাদীর জিম্মায় এবং 'হলফ' করা বিবাদীর জিম্মায়। (মিশ্‌কাত, ৩১৮ পৃঃ)।

উপরুক্ত হাদীস হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাদীর জিম্মায় 'হলফ' বা শপথ নাই। কিন্তু ইসলামী নীতি 'হলফ' অজ্ঞ কোন কোন বিচার-মজলিস কখন কখন বাদিকেও দেয়। কিন্তু এই পদ্ধতি ঠিক নহে। সঠিক পদ্ধতি ইহাই যে, বাদী নিজ দাবীর প্রমাণ পেশ করিবে এবং বিবাদী প্রমাণের অভাবে 'হল্‌ফ' গ্রহণ করিবে।

(৩) শরীয়তের অপর এক বিধান এই যে, অন্ততঃ পক্ষে দুই জন সাক্ষী শেশ করিতে হইবে। কোরান বলে—"পুরুষ সাক্ষী দুই জন পেশ কর, আর যদি দুই জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে এক জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক পেশ কর।

(৪) উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রমাণ পেশ করার ভার বাদীর উপর, কিন্তু বাদীর নিকট যদি কোন প্রমাণ না থাকে তবে শরীয়ত বিবাদীকে শপথ গ্রহণ করিতে বলে। কিন্তু ইহার এই অর্থ নহে যে, বাদী প্রমাণ পেশ করিয়া যখন দেখিবে যে, পূর্ণ প্রমাণ পেশ করিতে অসমর্থ তখন বিবাদীকে 'হলফ' করিতে বলিবে। বরং প্রথম অবস্থায়ই কাজীকে বাদীর জানাইতে হইবে যে, তাহার নিকট কোন প্রমাণ নাই। তখন কাজী যদি বুঝিতে পারেন যে, বিবাদীকে 'হলফ' গ্রহণ করিতে বলিয়া খামাখা বিরক্ত বা অপমানিত করা বাদীর উদ্দেশ্য নহে, তবেই কাজী বিবাদীকে 'হলপ' গ্রহণ করিতে বলিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা দুই ব্যক্তি এক ঝগড়া নিয়া আঁ-হজরতের (ছাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়। এক ব্যক্তি হজবের অধিবাসী, অপর ব্যক্তি কান্দার অধিবাসী হজবের অধিবাসী বলে, ইয়া রসুলুল্লাহ্, এই কান্দিবাসী ব্যক্তি অন্যায় ভাবে আমার জমি দখল করিয়া নিয়াছে। কান্দীবাসী বলিল, এই জমি আমার নিজের এবং ইহা আমার দখলে, বাদীর ইহাতে কোন দাবী নাই। তখন আঁ-হজরত (ছাঃ) বাদী হইতে প্রমাণ চাহিলেন। বাদী বলিল, আমার নিকট কোন প্রমাণ নাই। তখন আঁ-হজরত (ছাঃ) বলিলেন তবে বিবাদীকে 'হলফ' দিতে হইবে। বাদী বলিল, দুর্বৃত্ত ব্যক্তির হলফের কি পরওয়া। অর্থাৎ সে মিথ্যা হলফ করিয়া ফেলিবে। ইহার উত্তরে রসুল করীম (ছাঃ) বলেন বর্ত্তমান, অবস্থায় তোমার বিবাদিকে 'হলফ' দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই, অর্থাৎ শরায়ত এরূপ অবস্থায় এই ব্যবস্থাই রাখিয়াছে।

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাদীর প্রমানের অভাবেই বিবাদীর উপর 'হলফ' দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এস্থলে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমায়ই শরীয়ত বিবাদীর উপর 'হলফ' রাখিয়াছে। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমা শরীয়ত অনুযায়ী হলফের সাহায্যে বিচার করা যায় না। যথা—এরূপ হইতে পারিবে না যে, জায়েদ বকরের উপর কোন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিবে, অমার নিকট কোন প্রমাণ নাই, বকর হলফ গ্রহণ করুক। এরূপ স্থলে শরীয়তের বিধান এই যে, অভিযোগকারী হইতে প্রমাণ চাওয়া হইবে, এবং প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে, কেননা, সে বিনা-প্রমাণে তাহার এক ভাইকে দুর্ণাম করিল এবং তাহার মান হানি করিল।

(৫) কেমন করিয়া 'হলফ' দিতে হয় শরীয়তে তাহারও উল্লেখ আছে। ইব্‌নে আব্বাছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ-হজরত (ছাঃ) এক বিবাদীকে বলিয়াছিলেন—"সেই খোদার শপথ

কর যিনি ব্যতীত আর কোন ‘মাবুদ’ বা উপাস্য নাই এবং বল যে, আমার জিম্মায় বাদীর কোন হক নাই।” মিশ্‌কাত, ৩২০ পৃঃ)।

এই হাদীস হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে কাজী ‘কসম’ বা শপথের জন্য এরূপ বিশিষ্ট শব্দ বা স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিতে পারেন যদ্বারা তিনি মনে করেন যে, মূল ঘটনা প্রকাশ পাইবে। এই হাদীস হইতে আরো বুঝা যায় যে, যদি বিবাদী কাজির নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে ‘হলফ’ করিতে অস্বীকার করে তবে মোকদ্দমা বিবাদীর বিরুদ্ধেই ফয়ছলা করা হইবে।

(৬) যদি কোন বস্তুর দুই জন দাবীদার থাকে এবং উভয়ই নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে প্রমাণ উপস্থিত করে তবে এরূপ অবস্থায় শরীয়তের ব্যবস্থা এই যে, যাহার ‘কব্‌জা’ বা অধিকারে সেই বস্তু থাকিবে তাহার সপক্ষেই ফয়সলা বা মীমাংসা করা হইবে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, দুই ব্যক্তি একটি চার-পাই বা খাট লইয়া আঁ-হজরতের সমীপে উপস্থিত হয় এবং উভয়ই উহার দাবী করে এবং উভয়ই নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করে। তখন আঁহজরত (ছাঃ) যাহার দখল বা অধিকারে খাটটি ছিল তাহার সপক্ষেই ফয়ছলা করেন।

(৭) সাক্ষী সম্বন্ধে শরীয়তের আদেশ এই যে, কাহাকেও সাক্ষী মানা হইলে সে জরুর উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তবে কাহাকেও সাক্ষী মানা না হইলে নিজ হইতে গিয়া সাক্ষ্য প্রদান করা উচিত নহে। তবে যদি কাহারো কোন বিষয় জানা থাকে এবং বাদী তাহা অবগত না থাকে তবে সে বাদীর নিকট বা তখনকার হাকেমের নিকট যাইয়া বলিতে পারে যে, এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয় তাহার জানা আছে।

(৮) মিথ্যা শপথ-কারীগণ সম্বন্ধে শরীয়তের সাবধান বাণী রহিয়াছে। আঁ-হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—মিথ্যা শপথ সহরকে উজাড় বা ধ্বংস করিয়া দেয়’। তিনি আরো বলিয়াছেন—যে-ব্যক্তি আপন মোসলমান ভাইয়ের হক্ বা প্রাপ্য আপন ‘কসম’ বা শপথ দ্বারা বিনষ্ট করে তাহার উপর আল্লাহ্‌তা'লার বিচারে অগ্নি বা নরক ওয়াজেব (অবশ্য প্রাপ্য) হইয়া যায় এবং জান্নাত বা স্বর্গ হারাম হইয়া যায়।

স্বভাব যায় না ম’লে

একদিন ছিল, ভিটামিন কি বস্তু লোকে জান্‌তো না, কিন্তু তখনকার দিনেই তারা ভিটামিন্ খেত বেশী। আজ দেশের শিশুরা পর্য্যন্ত ভিটামিনের চার্ট যতই অনর্গল বল্‌তে শিখুক না কেন, আমাদের খাদ্যের সঙ্গে ভিটামিনের পরিমাণ দিনকে দিন ততই হ্রাস হ’য়ে চল্‌ছে। আজও আমরা লাল চা’ল দেখলে নাক সিট্‌কাই, কলে ছাঁটাই চা’ল না খেলে নাকি ভদ্দর সাজা চলে না। আজও আমাদের ভাতের ফেন নর্দ্দামা পথেই গড়িয়ে চলেছে, কিংবা বড় জোর গরু, ছাগলের পুষ্টি সাধন করছে। কাঁচা শাক সব্জি খাওয়াতো ঘাস খাওয়ারই সামিল হয়ে দাড়িয়েছে।

বই পড়ে পড়ে a, b, c, d, থেকে z পর্য্যন্ত কত কি ভিটামিনের নাড়ী-নক্ষত্র নিরূপণের চেষ্টা আমরা করছি, কিন্তু বেরীবেরী প্রভৃতি রোগের হাত থেকে নিস্তার পেলেম না। রোগ মুক্তি যদিই-বা ঘটে, বাঙ্গালীর দেহযষ্টি শীর্ণ হতে হতে বাতাসে ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে। কারণ কথায় বলে “স্বভাব যায় না ম’লে”। অবশ্যি রাতারাতি গোটা জাতিটার স্বভাব বদলে দেওয়া যাবে না তা মানি, কিন্তু বাঁচতে তো হবে। অনেকেই অজানা অচেনা বিদেশী ঔষধ খেয়ে ভিটামিনের অভাব পূরণ করেন, তাদের এটুকু জানা নেই যে আমাদের দেশেই এমন সব ঔষধের উপাদান ও উপকরণ রয়েছে যার তুলনায় সে-সকল বিদেশী ঔষধের কোন যোগ্যতা বা উপকারিতা একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের সেই প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে কে না জানেন? আজ দেশের চতুর্দ্দিকে আয়ুর্ব্বেদের যে প্রসার বা প্রচার দেখতে পাই, তার অনেকখানি কেবল এই পরহিতকামী মহাপুরুষের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম বলেই সম্ভব হয়েছে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ যোগেশবাবু প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঔষধাদি তৈরীর নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন ক’রেছেন। তা’থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেশীয় গাছ গাছড়া দ্বারা যে কয়টী ঔষধ বের করেছেন তার প্রত্যেকটী যুগান্তকারী আন্দোলনের সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাঁর তৈরী ‘মৃতসঞ্জীবনী’র কথাই ধরুন না কেন, কি ডাক্তার, কি কবিরাজ, কি হেলথ্ অফিসার, কি ভারতের জন সাধারণ যিনিই এই ঔষধ একবার ব্যবহার করেছেন, তাঁকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার কর্‌তে হয়েছে যে এরূপ ভিটামিন শক্তিসম্পন্ন ঔষধ আর তিনি দেখেন নাই। বল্‌তে কি যে কোন প্রকারের শারীরিক দুর্ব্বলতা বা অসুস্থতার জন্য কিম্বা বহুদিন ব্যাপী ব্যাধিজনিত কিম্বা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রসবের ক্ষয়পূরণের জন্য সাধনার মৃতসঞ্জীবনী অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যুদ্ধে ভারতের শিল্প

(স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান)

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষে যে শিল্প বিস্তার হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের সরবরাহ সচিব স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান গত ১৬ই জুলাই সিমলায় একটি বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত সার মুদ্রিত হইল। স্যার জাফরুল্লা খান শীঘ্রই সরবরাহ ও আইন সচিবের কর্ম্মভার পরিত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচার-পতির পদ গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাঁহার সময়ে সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে ভারতবর্ষের শিল্প বিস্তার কতখানি অগ্রসর হইয়াছে এই বক্তৃতাটির দ্বারা তাহা বিচার করা সম্ভব হইবে।

স্যার জাফরুল্লা খান বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের ২৫০টি বে-সরকারী ব্যবসায়ী কারখানা ও ২৩ টি রেলওয়ে কারখানা ভারতীয় সামরিক কারখানাগুলির সহযোগিতা করিতেছে। এই সকল কারখানাগুলিতে বর্ত্তমানে ৭০০ প্রকারের সামরিক-প্রয়োজনের দ্রব্যাদি তৈয়ার হইতেছে এবং উহাদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০,০০০। ৫৪ টী কোম্পানী কলকারখানার জিনিষ তৈয়ার করিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে যে-পরিমান গোলাগুলি তৈয়ার হইত বর্ত্তমানে তাহা প্রায় ২৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আর দুইটি পর্ব্বে উহা ৯৬ গুন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা

স্যার জাফরুল্লা বলেন,— "যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প বিস্তার কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাটা একবার আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস শেষ হইলে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ভারতীয় মুলধন, ভারতীয় শ্রমিক ও ভারতীয়দের উদ্যোগে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতরে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিও ১৯১৪—১৮ সালের তুলনায় বহুগুণ প্রসার লাভ করিয়াছে। সৈন্যবিভাগের জন্য যত বস্ত্র প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিই অনায়াসে যোগাইতে পারে এবং পাট তো ভারতবর্ষেরই একচাটিয়া ব্যবসায়। তাহা ছাড়া দেশের সর্ব্বত্রই ছোট বড় ও মাঝারি নানা ধরনের কারখানা আছে বর্ত্তমানে যে-গুলিকে প্রয়োজনমত সামরিক শিল্পদ্রব্য নির্ম্মানে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কৃষি ও খনিজাত দ্রব্যেও ভারতের প্রাকৃতিক ঐশর্য্য কম নহে। ইহা হইল আমাদের শিল্পবিস্তারের আশাজনক দিক। আর একটা দিকও বিবেচনা করিবার আছে,—তাহা আমাদের অভাবের দিক। আমাদের যাহা ছিল না তাহার কথাও আলোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ আমাদের সরকারী তাম্র নির্ম্মাণ কারখানাগুলি সাধারণ সময়ে সৈন্য বিভাগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মানের শক্তি উহাদের ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিও খনি, কাপড়ের কল, যানবাহন প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিল। বিমান পোত, মোটর গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিবার কোনই ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ভারতে ছিল না।

বস্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষ বিশেষ অগ্রসর, কিন্তু পশমী কম্বল, শীতবস্ত্র' প্রভৃতিতে ভারতীয় কারখানগুলির উৎপাদন পূরাপূরি প্রয়োজন মিটাইবার মত নয়, সৈন্যদের বুটজুতা এবং ঐরকম আরও অনেক জিনিষ আছে যাহা ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া কঠিন। সংক্ষেপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহাই হইল আমাদের শিল্প বিস্তারের সমৃদ্ধি ও ন্যূনতার চিত্র।

শিল্প বিস্তারের ধরণ

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্যের পথে বহু বিঘ্ন ঘটে। পূর্ব্বে যে সকল দেশ হইতে কলকারখানার যন্ত্রপাতি মালমসলা এমন কি বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি অনায়াসে পাওয়া যাইত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেগুলি আমদানীর পক্ষে নানা বিধিনিষেধ ও বিঘ্ন দেখা দেয়। কাজেই যুদ্ধের সময় নূতন শিল্পবিস্তারের প্রকৃত পদ্ধতি স্থির করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কোন ধরনের শিল্প-বিস্তারের দিকে আমরা মনঃসংযোগ করিব? যে শিল্পটি সফল হইতে চার বৎসর সময় লাগিবে তাহাতে আমাদের মালমসলা, যন্ত্রপাতি ও লোকজনকে আটক রাখা উচিত, কি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট শিল্প যাহা দুই বৎসরের মধ্যেই সফল হইবে তাহাতে মনোযোগ দেওয়া ভালো? এই প্রশ্নের একটা নিশ্চিত জবাব দেওয়া কঠিন। তবে খুব উচ্চ আশায় অতি বৃহৎ একটাতে হাত দিয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার চাইতে যাহা তাড়াতাড়ী হয় তাহাতে মন দেওয়াই বোধ হয় সাধারণতঃ বুদ্ধিমানের কাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, ভারতবর্ষ যদি এরোপ্লেনের ইঞ্জিন তৈয়ারে হাত দেয় তবে বছর পাঁচেকের আগে যুদ্ধের কার্য্যে তাহার কোন উপযোগিতা বুঝা যাইবে না। তাহার চাইতে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য এমন সব জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করা উচিৎ যাহা খুব তাড়াতাড়িই তৈয়ার হইতে পারে।

অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ

বন্দুক, গোলাগুলি, যানবাহন ইত্যাদি সম্পর্কেই বেশীর ভাগ লোকের উৎসাহ। এই সকল জিনিষ নির্ম্মানে মূল প্রয়োজন হইল বৃহৎ ইস্পাতশিল্প। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে তাহা আছে। যদি কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটে তবে ভারতের এই দৃঢ়ভিত্তি ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন পরিমান অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমানের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইবে। যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যান্ত্রিক বাহিনীর

যে সকল আরমার প্লেট (বর্ম্মের ন্যায় পাত) প্রয়োজন তাহা ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলি যোগাইতেছে।

ইস্পাতের পরেই বন্দুক ও গোলাগুলি নির্ম্মানের কারখানাগুলির স্থান। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ বন্দুক এক বৎসরে নির্ম্মিত হইত বর্ত্তমানে আমরা তাহার প্রায় পাঁচগুণ তৈয়ার করিতেছি এবং ভবিষ্যতে বর্ত্তমান উৎপাদন পরিমানেরও প্রায় আট গুণ তৈয়ার করিবার আশা রাখি। রেলওয়ে কারখানা ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি অস্ত্র শস্ত্রের বিশেষ করিয়া বোমার নানাবিধ ক্ষুদ্র অংশ নির্ম্মাণে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বোমার খোল ও উহা ফাটাইবার “ফিউজ” (অগ্নি সংযোগের পলিতার ন্যায় জিনিষ) দেশের নানা স্থানে তৈয়ার হইতেছে। এইগুলি তৈয়ার করিতে কিপ্রকার দক্ষতা ও বিশেষ নৈপুন্যের প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

যন্ত্রপাতি তৈয়ার

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে যে সকল কলকব্জা দরকার এবং যেরূপ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন, ভারতে তাহার কোনটাই নাই। তবুও ৫০টি কোম্পানীকে নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় রেল কোম্পানীর কারখানাগুলি বর্ত্তমানে সপ্তাহে ১০০০ করিয়া গজ (gauges) তৈয়ার করিতেছে এবং উহাতেও চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। ইতিপূর্ব্বে সমস্ত গজই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। অটোমেটিক (যাহা আপনা আপনি চলে) অস্ত্র ও রাইফেল উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিমান পোত ও জাহাজ নির্ম্মাণ

ভারতবর্ষে ট্যাঙ্ক জাতীয় যুদ্ধযান নির্ম্মানের ব্যবস্থা হইয়াছে। একটি বিমানপোত নির্ম্মানের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় সিপইয়ার্ড (জাহাজ নির্ম্মানের কারখানা) গুলিতে মাইন পরিস্কারক জাহাজ, জীবনরক্ষক তরী প্রভৃতি ছোট ছোট জলযান তৈয়ার করিতেছে। ভারতে বৃহৎ বাণিজ্যপোত নির্ম্মান সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা অনেক আশাজনক কথা শুনিয়াছি। প্রথম জাহাজটি যদি যথোচিত সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হয় তবে এই যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় জাহাজ নির্ম্মান শিল্প সফল না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। ভারতের একটি কোম্পানী ৩৪,৪০০ মাইল তামার বৈদ্যুতিক তার এবং ১৬,০০০ হাজার মাইল টেলিফোনের তার নির্ম্মাণ করিতেছে। রেলওয়ের লাইন ও মালগাড়ী প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমানে নির্ম্মিত হইতেছে।

সাড়ে ছয় কোটি টাকার তাঁবু

গোলাগুলি ছাড়াও যুদ্ধ চালাইতে যে সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রয়োজন হয় এইবার তাহার কথা বলা যাউক। সৈন্যবিভাগের জন্য যে বস্ত্রের প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি পুরাপুরি রূপে যোগাইতেছে। ভারতের শীতবস্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের সমুদয় উৎপাদন সামরিক বিভাগের কাজে লাগিতেছে। সৈন্যদের খাকি কাপড় বিশেষ ভাবে দরকার, তাহা ছাড়া তাহাদের জন্য তাঁবু, মশারী ও কম্বলও বহু পরিমানে প্রয়োজন হয়। সুতিবস্ত্র ও পশমবস্ত্র মিলাইয়া এবৎসর ভারতের কলগুলি ৩২৪,০০০,০০০ বত্রিশ কোটি গজ বস্ত্র তৈয়ার করিতেছে। এক তাঁবুর খরচই হইবে সাড়ে ছয় কোটি টাকা এবং কম্বল কেনা হইবে দেড় কোটি টাকার। যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষের সমর-বিভাগের সর্ব্বশুদ্ধ যাহা খরচ হইত (৪৫ কোটি টাকা) বর্ত্তমানে একমাত্র সৈন্যদের বস্ত্র ও কম্বল প্রভৃতিতেই সেই টাকা ব্যয় হইতেছে। এই সকল বস্ত্র দ্বারা সৈন্যদের পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ার করিতে ৩০ হাজার দর্জ্জী খাটিতেছে। ৩০ লাখ জোড়া বুটজুতা ভারতবর্ষে তৈয়ার হইতেছে। লাগাম ও ঘোড়ার জিন তৈয়ার করিবার যে সরকারী কারখানা আছে তাহাতে আগে ২০০০ লোক কাজ করিত, বর্ত্তমানে তাহাতে নিযুক্ত লোক সংখ্যা ১২০০০। তাহা ছাড়া বে-সরকারী আরও ২০০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঐ সকল জিনিষ তৈয়ার করিতেছে।

অন্যান্য জিনিষ

টেলীগ্রাফের তারের খুঁটি, জাহাজ হইতে অবতরণের জেটি ও গোলাগুলি প্যাক করিবার বাক্স প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে যে কাঠের প্রয়োজন ভারতের বন হইতে তাহা যথেষ্ট পরিমানে পাওয়া যাইতেছে। এ বছর ৫ লক্ষ টন কাঠ সরবরাহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমানে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, এবং লৌহ সাম্রাজ্যের যুদ্ধোপকরণ হিসাবে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।

রসায়ন শিল্পের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং সব কিছু ভালো মত চলিলে সালফার, দ্রুত বিস্ফোরক রসায়ন ও লুব্রিকেটিং অয়েল (কলের তৈল) প্রভৃতি বস্তু সম্পর্কে ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। ঔষধ ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত কার্য্যেও ভারতবর্ষ বিশেষ আগাইয়া গিয়াছে। শুধু ভারতীয় সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই নহে, সাগরপারে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর জন্যও ভারতবর্ষ বহু জিনিষ পাঠাইতেছে এবং যতই দিন যাইবে ততই ভারতের এই উৎপাদনও শিল্প প্রচেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। স্বচ্ছন্দতা অবসর, লাভ বা স্বাস্থ্য প্রভৃতি যাহা কিছু শান্তি সময়ে আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান, বর্ত্তমানে যুদ্ধের সঙ্কটে আমরা তাহার কোনটির কথাই ভাবি না। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা সর্ব্ব বিষয়ে এই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিই একান্তভাবে মনোনিবেশ করিব।

জগৎ আমাদের

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

খোদাতা'লার ফজলে এবার ঢাকা হইতে আমাদের তিন জন ভ্রাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন হইলেন যশোহর নিবাসী মৌলবী সৈয়দ সাজেদুর রাহমান সাহেব। তিনি ঢাকা তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ হইতে তিন বৎসরের কোর্স সমাপন করিয়া এবার "হেকীম হাজেক" ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা হইলেন ব্রাহ্মনবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত তারুয়া নিবাসী মিঃ মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী। তিনি এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির নব প্রবর্ত্তিত এগ্রিকালচার বা কৃষিবিজ্ঞান বিভাগের বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করিয়া বর্ত্তমানে ঢাকা এগ্রিকালচার ফার্ম্মে প্রেকটিকেল ট্রেনিং-এ আছেন। তৃতীয় ভ্রাতা হইলেন মিঃ মীরজা আলী আখন্দ। তিনি সাধারণ বিজ্ঞানে বি, এস্-সি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের সকলেরই কৃতকার্য্যতাকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য এবং আহমদীয়া জমাতের জন্য বা-বরকত বা মঙ্গল ও কল্যানময় করুন— আমীন।

শুভ বিবাহ

বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের বাংলা প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার সর্ব্বপ্রথম আমীর মরহুম হজরত মোলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মৌলবী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মৌলবী-ফাজেল, মোবাল্লেগ সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়া, কাদিয়ান, বিগত ১৫ই জুন তারিখে মুঙ্গের নিবাসী সৈয়দ মুছা রাজা সাহেবের প্রথমা কন্যা সৈয়দা রাজিয়া বেগমের সহিত শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার অলিমা অনুষ্ঠানও সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে সস্ত্রীক কাদীয়ান শরীফে আছেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন ইহ-পরকালে মঙ্গলময় করেন। আমরা নব দম্পতিকে মোবারকবাদ জানাইতেছি।

ভাঙ্গাচুরা লোহার ব্যবহার

রসায়নিক উপায়ে ইস্পাত প্রস্তুত

ভাঙ্গাচুরা লোহা হইতে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে রাসায়নিক প্রথায় ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। ইহা দ্বারা রেলওয়ে সমূহের আবশ্যকীয় স্প্রীং ইস্পাতের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে। এতকাল উহা বিদেশ হইতেই আমদানী হইত।

ভারতের নানা স্থান হইতে যে সকল ভাঙ্গাচুরা লোহা সংগৃহীত হইতেছে তাহা হইতে ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য বিশেষ ধরণের চুল্লী বসাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

তাহা ছাড়া বোমা তৈয়ার করিবার কালে যে সকল ইস্পাতের টুকরা ও ভাঙ্গাচুরা জমে তাহা হইতে আবার নূতন ইস্পাত তৈয়ার করা যায় কিনা সে পরীক্ষাও চলিতেছে।

শাক শব্জী শুষ্ক রাখিবার চেষ্টা

সরবরাহ বিভাগের উদ্যম

পিয়াজ, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম প্রভৃতি শুষ্ক করিয়া রাখা যায় কি না সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতেছেন। ঐ সকল শব্জীর মৌসুমের সময় নির্ভর যোগ্য ব্যবসায়ীকে পরীক্ষামূলক ভাবে অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

কারখানার অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার

সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগ

ভারতীয় সরবরাহ বিভাগের একটি নোটে প্রকাশ যে কয়েকটি চিনির কলকে এ্যাম্বুলেন্সের ষ্ট্রেচার নির্ম্মাণের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ভারতের চিনির কলগুলিতে সারা বৎসর কাজ চলে না। আখ মাড়াইবার মৌসুম শেষ হইয়া গেলে কয়েক মাস কলগুলি বসিয়া থাকে। এই গর-মৌসুম সময়টা যাহাতে কাজে লাগান যায় সেজন্য পরীক্ষামূলক ভাবেই এই অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এই কলগুলিতে প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও মিস্ত্রী, কারিগর সবই আছে।

সরবরাহ বিভাগ কিছুকাল যাবত অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছিলেন, ভারতের বিভিন্ন কল কারখানাগুলির অবসর সময়ে—(অর্থাৎ যে-সময়টা কাজ অভাবে কলকারখানাগুলিকে বসিয়া থাকিতে হয়)—সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ার করিতে পারা যায় কিনা। বিষয়টি এখনও অনুসন্ধানাধীন আছে।

বাবুর্চ্চী ও আর্দালীদের যুদ্ধে যোগদান

খুন্তী-বেড়ী ছাড়িয়া কামান

তব্রুকে ব্রিটিশ সৈন্যদলের বাবুর্চ্চি ও আরদালীরা মিলিয়া একটি বে-সরকারী 'গোলন্দাজ দল' গঠন করিয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে 'বুশ্ আর্টিলারি'। ধৃত ইতালীয় কামানগুলি জোগাড় করিয়া তাহারা রীতিমত দক্ষ গোলন্দাজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যখন ইহারা আরম্ভ করে তখন ইহাদের কামান ছুঁড়িবার ক-অক্ষর জ্ঞানও ছিল না, কিন্তু ক্যাম্পের কাজ হইতে ছুটী পাইলেই ইহারা আসিয়া গোলাগুলি ছোঁড়া শিখিত। অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমানে ইহারা খুবই দক্ষ গোলন্দাজ হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি লক্ষ্যবস্তু না দেখিয়াও এখন তাহারা গোলা ছুঁড়িতে পারে। জার্ম্মানদের উপর গোলা নিক্ষেপ করাটা বর্ত্তমানে তাহাদের অন্যতম আমোদ।

মেহেদী আখেরেজ্জমান

জান না কি তুমি !
বলিয়া গেছেন নবিজী
আসিবেন ইমাম মাহদী
জমানে আখেরে।
ইমাম মাহদী আখেরেজ্জমান করেছেন আহ্বান
সারা পৃথিবীরে, দেখাইয়াছেন তাঁর আগমনের নিশান।
এসেছেন তিনি পৃথিবীর বুকে অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে
এখনও অনেকে হেলায় খেলায় চায় না তাঁরে ফিরে।

এখনও কি আছে কিছু বাকি চিনিবারে তাঁরে
এত এত আলামত, এত এত নিশানাত দেখিবার পরে।
চলে গেছেন তিনি এই মহা ইহলোক ছাড়ি
বেহেস্ত কাননে দিয়ে সেই মহা পুলছেরাত পারি
এসে ছিলেন তিনি ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তরে
পঞ্চনদের ছোট্ট এক পল্লী কাদিয়ান ধরে।

আলী আজম, করুরা

THE FORTNIGHTLY AHMADI

বার্ষিক চাঁদা—৩৲ প্রতি সংখ্যা—৵০ Regd. No. C.—1356

হাদীকুল-মাহদী

এই গ্রন্থে হজরত ইমাম মাহদী ও মসিহ্-মাউদ সংক্রান্ত যাবতীয় জটিল সমস্যার সমধান পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে আহম্‌দীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ আঃ-এর প্রতি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যাবতীয় এতেরাজের অকাট্য জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। সত্যান্বেষী প্রত্যেক মোসলমান ভ্রাতার ইহা এক বার পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতার নিকট ইহার এক কপি থাকা অপরিহার্য্য। মূল প্রতি কপি ২৲ টাকা। জিল্‌দা-করা কপি ২৷৷০ টাকা। ডাক-মাশুল প্রতি কপি ৷৷০ আনা। একত্রে একাধিক কপি লইলে ডাকা-খরচ কম লাগিবে। সত্বর অর্ডার দিন, নতুবা ফুরাইয়া গেলে পরে আফসোস করিবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ম্যানেজার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া

৪নং বক্সিবাজার, ঢাকা

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে "স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহ-চিকিৎসা" এবং "আরোগ্যের পথ" প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—**যোগেশচন্দ্র ঘোষ**, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪৷৷০, মধ্যম ২৷৷০ ও ছোট ১৷৷০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ৵০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published & Edited by Abdur Rahman Khan' B. A.
from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).